সাধারণ লোকের কাহিনী

রশীদ করীম

ঐতিহ্য

ভূমিকা

'সাধারণ লোকের কাহিনী' উপন্যাসটি 'রোববার' পত্রিকার ১৯৭৯ সালের ঈদ-সংখ্যা এবং তার পরবর্তী সংখ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসে বর্ণিত সব ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দৈবাৎ কোনোখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থাকলে ধরে নিতে হবে, তা নিতান্তই আকস্মিক ও কাকতালীয়।

ঢাকা
২২ মে, ১৯৮১

রশীদ করীম

প্রথমেই দক্ষিণের এই বারান্দাটার কথা বলতে হয়। বারান্দাটা শুরু হয়েছে পূর্ব দিকের এক চিলতে অংশ থেকে, তারপর পুরো দক্ষিণ দিকটা নিজের বাহু দিয়ে ঘিরে উত্তরদিকের রান্নাঘরে শেষ হয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকারে। জ্যামিতিক অর্থে বারান্দাটাকে অর্ধ-বৃত্তাকার বলা যাবে না— বলতে হলে বৃত্তের আদলটা বদলে ফেলতে হয় আর সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। তবু, সাহিত্যিক ভাষায় বারান্দাটির বর্ণনা দিতে হলে অন্তত এই মুহূর্তে আর কোনোভাবে আমি তা করতে পারছি না।

দক্ষিণদিকের এই বারান্দাটার আর একটা সুবিধা এই যে, সামনে আর কোনো ঘরবাড়ি নেই, দক্ষিণদিকের বিখ্যাত হাওয়াটা পুরোই পাওয়া যায়। অন্য কোনো লেখক হলে বলে দিতে পারতেন, সামনে ঠিক কতোটা জমি খালি পড়ে আছে; কিন্তু শুধু চোখে দেখে জমির মাপজোক আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে অনুমান করি, ঐ খালি জমিতে দুটি প্রকাণ্ড সাইজের ম্যানসন সহজেই তোলা যায় এবং একদিন নিশ্চয়ই হবে। সেদিন এই বারান্দার আকর্ষণ অনেক কমে যাবে। আপাতত মস্ত সুবিধা এই একেবারে সামনে ঘরবাড়ি নেই। আবার শুরু হয়েছে মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা রেখে, সেগুলো আবার পরপর চারটি একতলা ঘর, দেয়াল আর মেঝে ইট-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি, ছাদ টিনের। ঘরগুলোতে ইলেকট্রিক, গ্যাস, পানি সবই আছে, মাসিক ভাড়া চারশ' টাকা, দেখতে ছবির মতো। ভাড়া বেশ কমই বলতে হবে। যদিও কামরা একটিই কিন্তু লাগোয়া বাথরুম, একটা রান্নাঘর এবং এক চিলতে বারান্দা আছে এবং শেষোক্তটি ছোট্ট পরিবারের বসার ঘর করা যায় এবং করা হয়েছেও। পরপর চারটি ঘর—আমার তেতলার বারান্দা থেকে প্রথমটাই শুধু দেখা যায়। সেই একতলা বাড়িটিতে এক তরুণ দম্পতি বাস করে। মেয়েটি ঠিকই বুঝেছে, তেতলার বারান্দা এবং দোতলার বারান্দা থেকেও তাদের সেই একটি মাত্র কক্ষটি, যেখানে অসন-বসন-শয়ন সবই করতে হয়, পরিষ্কার দেখা যায়। তাই সে একটা নীল পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে, পর্দাটিতে ছুঁচের সুন্দর কাজ। মেয়েটিকে আজও দেখি নি। মাত্র একদিন তার বাহুটি চোখে পড়েছিল। বাতাসে পর্দা একবার উড়েছিল—তখন। বাহুটি সুন্দর!

আগে যে বাড়িটায় বাস করতাম, দশদিনে সেটি ছেড়ে এসেছিলাম। বাড়িঅলা অবশ্য পুরো এক মাস সময় দিয়েছিলেন; কিন্তু দশদিনেই এই বাড়িটার

খোঁজ পাওয়া গেল। পুরো এক মাসের সুযোগ নিতে গিয়ে এ-বাড়িটাও হাতছাড়া হবে এবং আর একটি বাড়ি নির্দিষ্ট ভাড়ার মধ্যে নাও পেতে পারি। তাই দশদিনেই উঠে চলে এলাম। একথা বলবো, বাড়িঅলা আমাদের খুব অকৃত্রিম প্রশংসা করেছিলেন। এক মাস সময় দিলেন অথচ দশদিনেই বাড়ি খালি করেছিলাম—এতোটা ভালো যে আমাদের মধ্যে আছে, আমাদের পূর্ববর্তী আচরণ দেখে তাঁর তা মনে হয় নি। ভদ্রলোক খুবই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু এক মাস অপেক্ষা করলে আর একটি বাড়ি নাও পেতে পারি, আমাদের এই হিসেবটা তিনি বুঝতে পারেন নি।

আমরা বাড়িটা ছেড়ে দেয়ার আট-দশ দিন পরই সেই বাড়িটাই চার হাজার টাকায় ভাড়া হয়ে গেল। যে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি সেটি ভাড়া হলো কি না আর হয়ে থাকলে কতো টাকায় হলো সে সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহলই ছিল না। কিন্তু আমার স্ত্রীর ছিল, কারণ বাসাটি তিনি ছাড়তে চান নি। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, বাড়িটি ভাড়াই হবে না—আরো বেশি টাকায় ভাড়া হওয়ার তো কোনো কথাই ওঠে না। কিন্তু আমার মনে হয়, মুখে বললে হবে কি, মনে-মনে তিনি এ আশঙ্কা ঠিকই করেছিলেন যে, বাড়িটা ভাড়া হয়েই যাবে। ড্রাইভার যখন সেই শোচনীয় সংবাদটাই এনে দিলো এবং আরো বললো যে চার হাজার টাকায় ভাড়া হয়েছে, তখন ক'দিন আমার স্ত্রী কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন নি। আগে যে বাড়িটায় ছিলাম সেটি দোতলা। একতলায় থাকেন স্বয়ং মালিক এবং দোতলায় আমরা থাকতাম। বছর দু'এক পর মালিক হিসেব করে দেখলেন যে, তিনি এখন সহজেই বেশি ভাড়া পেতে পারেন। কিন্তু একটা রেজিস্ট্রি করা লিইজ-এগ্রিমেন্ট ছিল বলে আমাদের উঠে যেতে বলতে পারছেন না। সুতরাং শুরু হলো পানির কষ্ট, যাতে আমরা নিজেরাই উঠে চলে যাই। চলে যেতে আমাদের খুব আপত্তি ছিল না; কিন্তু আর একটি বাড়ি খুঁজে বেড়াও, মালপত্র সরাও, টেলিফোন শিফ্‌ট্ করতেও কেটে যাবে ছয় মাস। এই সব অসুবিধার কথা ভেবে আমরা সে চেষ্টা করি নি। এবং বাড়িঅলা অপেক্ষা করে আছেন কবে লিইজের মেয়াদ শেষ হবে।

পানির অভাবের পুরো দোষটাই অবশ্য একা বাড়িঅলার নয়। হালে পানির চাপটাই কমে গেছে, দোতলায় সহজে পানি ওঠে না। অবশ্য আমার সব অসুখেরই চিকিৎসা আছে। এই অবস্থা দেখে অনেক গৃহস্বামীই পানির মোটা পাইপ বসিয়ে এবং কাজটির জন্য তাঁরা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন নি, নিজের উদ্যোগেই সেটা সেরে নিয়েছেন। যাই হোক, মোটা পাইপ বসিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমাদের বাড়িঅলা যে সে কাজটা করেন নি তা তাঁর উদ্যোগের অভাবের জন্য নয়। করলে, পানির আরাম পেয়ে উঠে যেতে আমরা গড়িমসি করবো, সেই আশঙ্কায়। এবং আমরাই-বা কী করে অমন একটা

বেআইনি কাজ করতে বলি। আমরা শুধু বলেছিলাম, পানির একটা বড় ট্যাঙ্ক বসিয়ে দিলে, পানির কষ্টটা দূর হয়।

দেখলাম, মিস্ত্রি-টিস্ত্রি এনে একটা খুব বড় পানির ট্যাঙ্ক বানানো হচ্ছে। জিনিসটা লোকে বাজার থেকে কিনেই আনে। নিজের বাড়িতে মিস্ত্রি আনিয়ে অমন একটা জিনিস বানাতে সেই প্রথম দেখলাম। যাই হোক, স্ত্রীকে বললাম, তুমি শুধু শুধু দোষ দাও। মিজান সাহেব লোক আসলে খারাপ নন। দেখছো না, বলতেই ট্যাঙ্ক বানিয়ে দিচ্ছেন। আমার স্ত্রীও লোক খারাপ নন। আমার কথাটির যৌক্তিকতা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। হঠাৎ তার মুখটা অপরাধীর মতো মলিন হয়ে গেল।

ক'দিন থেকে দেখছি, ট্যাঙ্কটা তৈরি হয়ে নিচের উঠোনে পড়ে আছে। রোদ্দুরে ট্যাঙ্কের শরীরটা ঝকমক করছে; কিন্তু ছাদে আর উঠছে না, মিস্ত্রিরাও চলে গেছে, লাগানোর কোনো লক্ষণও নেই।

বলা বাহুল্য, মিজান সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর যথেষ্ট জানাশোনা আছে। মিজান পত্নী বয়সে বিশ-তিরিশের বড়। আমার স্ত্রী তাঁকে বুবু বলে ডাকে। তিনিও পরম স্নেহে আমার স্ত্রীকেও বুবুই বলেন।

একদিন দুপুরবেলা আর দশটি কথার পর আমার স্ত্রী বললেন, বুবু, ট্যাঙ্কটা পড়ে আছে দেখছি, কবে লাগাবেন। মিজান সাহেবের স্ত্রী নিজের হাতে একটা পান বানিয়ে এগিয়ে দিলেন। বললেন, বুবু দেয়ার তো খুবই ইচ্ছা। কিন্তু পারছি কই! টাকার অভাব। তোমার সাহেবকে বলো না, ভাড়াটা আর হাজার খানেক টাকা বাড়িয়ে দিক। স্ত্রী সেই সুপারিশই করেছিলেন আমার কাছে। কথাটা শুনে আমার খুব রাগ হয়েছিল। ট্যাঙ্ক বানানোর পয়সা আছে আর লাগিয়ে দেয়ার সামান্য কটি টাকা নেই। তাছাড়া, এমনিতেই মিজান সাহেবের টাকার কোনো অভাব আছে? রাগ পড়ে যেতেই আমাকে মানতে হলো, বাড়িঅলাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। বেশি ভাড়া পেলে তিনি কম ভাড়ায় বাড়ি দেবেন কেন! বাড়ি তৈরি করতে আজকাল যে কী খরচ সে তো সবাই জানে। ভাড়া যতোই হোক, ট্যাক্স-ফ্যাক্স দিয়ে কিছুই থাকে না। ইনভেস্টমেন্ট উঠে আসতে বিশ-ত্রিশ বছর লাগে। অবশ্য একটা কথা বলা যায়। মিজান সাহেব বাড়ি তৈরি করেছেন ঊনসত্তুর সালে, যখন গৃহ নির্মাণের ব্যয় সে রকম কিছু ছিল না; কিন্তু ভাড়াটা নিচ্ছেন তিনি আজকের হিসেবে। তবু বেশি পেলে কেউ কম নেবে কেন?

এখন ট্যাঙ্কটা লাগানো হয়েছে। ঐ পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় দেখেছি। ভালোই হয়েছে। নতুন ভাড়াটে এবং বাড়িঅলা উভয়েরই আমি মঙ্গল কামনা করি। তাঁরা সুখে থাকুন।

আমাদের এই নতুন ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে। একমাত্র এই বারান্দাটার জন্য।

নতুন বাড়িতে এসে ঘরদোর, দরজা, জানালাগুলো অতিক্রম করে, প্রথমেই বাথরুমগুলোর কলগুলো খুলে দেখলাম। কী আশ্চর্য! কল দিয়ে পানি পড়ে যে দেখছি। এখন বিকেল তিনটা। সব বাড়িতেই পানির সঙ্কট এই সময়টাই চরম। অথচ এই ফ্ল্যাটে এখনো পানি আছে। আর কোথায় কী আছে দেখবার আগেই ঠিক করে ফেললাম, এই ফ্ল্যাটটা আমাদের চাই।

বাড়িঅলা একজন রিটায়ার্ড কাস্টমস্ অফিসার। তাঁর বসবার ঘরে বসে কিছু আলাপ হলো। দু'কথাতেই সব পাকা হয়ে গেল। চা-বিস্কুট খেলাম। পরশুদিন রোববার। বলে এলাম, পরশুদিনই সব মালপত্র আসবে। আমরা আসবো তার পরের দিন সকালবেলা। মনে হলো, বাড়িঅলার সঙ্গে বনিবনা হবে ভালো। ছয় মাসের আগাম ভাড়া দেবো, লিইজ এগ্রিমেন্ট তৈরি হবে, অথচ এগুলো হাতে পাওয়ার আগেই তিনি আমাদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন। লোকটি নিশ্চয়ই সজ্জন।

বললাম, একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট চেকটা তৈরি করবে, লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট লিইজ এগ্রিমেন্টের শর্তগুলো পরীক্ষা করে দেখবে। দিন দশ-বারো সময় লাগবে; কিন্তু কোনো চিন্তা করবেন না। বাড়িঅলা তাঁর উপযুক্ত জবাবই দিলেন। বললেন, চিন্তা করছি না। পরশুদিন পয়লা তারিখ। আপনারা পয়লা তারিখেই চলে আসুন।

তেতলার বারান্দা থেকে দক্ষিণদিকের যে খোলা জায়গাটার কথা বলেছি, আমরা এখন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি, গাড়িতে উঠবো। বাড়িঅলা সাহেবও আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছেন। এই খোলা জমিতে মস্ত-মস্ত আরো দু-তিনটি বাড়ি সহজেই উঠতে পারে। জায়গাটা অবশ্য বাড়িঅলারই—চারদিক পাঁচিল তুলে নিজের সীমানা সুরক্ষিত রেখেছেন। আমি পায়ে একটা ক্যাজুয়াল পরেছিলাম—আঙুলগুলো জুতোয় এখন আবৃত নয়। হঠাৎ বাম পায়ের বুড়ো আঙুলটার ওপর একটা কিছু ছোবল দিলো। সাপ? না, অতোটা ভাবি নি; কিন্তু ভেবেছিলাম কুকুর। আসবার সময় একটি ছোটো কুকুর দেখেছিলাম। চমকে তাকিয়ে দেখি, না কুকুরও নয়, একটা মোরগ আঙুলটা ঠুকরে দিয়েছে। বাড়িঅলার অমন স্ফীত স্বাস্থ্যবান আঙুলগুলো। থাকতে আমারটাই যে কেন পছন্দ হলো কে জানে। চারদিকে অনেকগুলো মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের উল্লাস দেখে মনে হয়, সুখেই আছে তারা এখানে।

এতো মুরগি যখন আছে, পিজরাপোলও থাকবে নিশ্চয়ই। আজকাল পিজরাপোল বড় একটা দেখা যায় না। কৌতূহল হলো,সেটা কোথায় দেখার জন্য চারদিক একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। বলতে গেলে চোখের সামনেই আছে, অথচ চোখে পড়ে নি। পাশে অনেকগুলো লম্বা লম্বা গাছ, সেগুলোর ঝুলেপড়া ডালপালা কেমন যেন আড়াল করে রেখেছে। আসলে আড়াল একটুও করে নি, তবু পিজরাপোলটা সহজে চোখে পড়ে না, গাছের ডালপালাগুলোই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। পিজরাপোলটি বেশ বড়। শ'খানেক মুরগি স্বচ্ছন্দে সেখানে বসে করতে

পারবে। কিন্তু গাছের নিচে ছায়ায় ঢাকা পিজরাপোলটিকে কেন জানি না আমার কাছে একটা সর্বজনীন কবরের মতো মনে হলো, যদিও জিনিসটি যথারীতি বেড়া দিয়ে তৈরি।

বাড়িঅলা বললেন, অতোগুলো মুরগি দেখে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন?

—'না। আশ্চর্য হবো কেন। অমন তো থাকে অনেকের।'

—'দিনে চারটি বাচ্চা মুরগি লাগে শুধু, আমার জন্য। বাচ্চা মুরগির মাংস ছাড়া ও আর সবকিছুই ডাক্তার মানা করে দিয়েছে।'

বাড়িঅলা সাহেবের বয়স পঞ্চান্নের মতো হবে। লম্বায় ছ'ফুটের মতো হবেন। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। খুব মোটাসোটা। হাতে একটি ছড়ি। পেটটা বড্ড উঁচু। আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন, হাজার হোক একজন মহিলা। কিন্তু বাড়িঅলা হাতকাটা গেঞ্জি আর হাফ-প্যান্ট পরে অম্লান বদনে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন।

মুরগির মাংস আমিও পছন্দ করি। ডাক্তার যদি আমাকেও দিনে চারটি বাচ্চা মুরগির মাংস খেতে বলে এবং আর সব নিষেধ করে দেয়, আমি একটুও দুঃখিত হবো না। এমনকি ভাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই আমি কাজটা করতে এই মুহূর্ত থেকেই রাজি। কিন্তু অসুবিধাটা অন্যখানে, যে কারণে ডাক্তার অমন একটা নির্দেশ দিলেও সেটা পালন করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু মুরগিগুলোকে একেবার দেখে এবং পর মুহূর্তে বাড়িঅলার শরীরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, যখন দিনে তার চারটি বাচ্চা মুরগি খাওয়ার কথা মনে পড়লো, তখন হঠাৎ মনে হলো, লোকটি একটা ভ্যাম্পায়ার। এমন অন্যায় চিন্তা মানুষের মনে কিন্তু আসে কখনো-কখনো।

গাড়িতে উঠে বসেছি। বড্ড গরম পড়েছে। আমি কাচটি নামিয়ে দিলাম। একটু হাওয়া আসুক। অন্য সময় হাওয়া আসে বলেই কাচ তুলে রাখি। বরং একটু গরম সহ্য করি।

চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। বড় অস্বস্তি লাগে। ড্রাইভারের নাম হাসান। সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। এমন সময় বাড়িঅলা খপ করে গাড়ির জানালায় হাত রাখলেন। অতো কাছে থেকে তাঁর হাত এই প্রথম দেখলাম। সাধারণ মানুষের হাত—কোনোখানেই একটু অন্যরকম নয়। তবু হঠাৎ মনে হলো একটু যেন অন্যরকম আছে কোনোখানে, খুঁটিয়ে দেখার সময় পেলে সেটা চোখে পড়তো। কিন্তু ততোক্ষণে তিনি আবার হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন। কারণ কী কিছুই বুঝলাম না; কিন্তু মনের মধ্যে একটা অশুভ ছায়া পড়লো।

মাথাটা জানালার ভেতর দিয়ে গলিয়ে বাড়িঅলা জিগ্যেস করলেন, আপনার দেশ যেন কোথায়?

বললাম কোথায়। একবার ভাবলাম, তার দেশ কোথায় সেটাও জিগ্যেস করে জেনে নিই। কিন্তু জিগ্যেস করলাম না। কার দেশ কোথায় সেটা জানার জন্য আমি কোনোদিনই কোনো কৌতূহল বোধ করি নি।

বাড়িঅলার হাত আর দশজন লোকের হাতের মতো হতে পারে। হতে পারে বলছি কেন— নিশ্চয়ই তাই হবে। কিন্তু তাঁর একটি চোখ আর দশজনের মতো নয়। একটি চোখে লেন্স আছে। জানালা দিয়ে যখন মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন দেখেছি। আগে বুঝতে পারি নি।

হাসান গাড়ি ছেড়ে দিলো। আঁকাবাঁকা কয়েকটি গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তে হয়। এই গলিগুলোর সঙ্গে পাশের ঘরবাড়ির একটা নিবিড়তা আছে। এই গলিগুলোকে রাজপথ মনে হয় না। মনে হয় এই পাড়াটারই অন্দরমহল। গাড়ি-টাড়ি অবশ্য আসে, কিন্তু গাড়িগুলো সবই অতি পরিচিত। এখানে যেসব গাড়ি যাতায়াত করে তার প্রায় সবগুলোই এই পাড়ারই বাসিন্দাদের। তাই গলিটাকে পাড়ার লোকেরা, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা উঠোনের মতো ব্যবহার করে।

বাইরে বেরিয়ে চোখে পড়লো যে, এই গলিটার দুই পাশে যে একতলা বাড়িগুলো ছিল, সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটার ওপরই দোতলা-তেতলা উঠেছে। ইটভাঙা, সিমেন্ট, সুরকির ট্রাক, ছাদ পেটানো এসবের মহোৎসব শুরু হয়ে গেছে। সবগুলো বাড়িই একতলা ছিল। একই সঙ্গে সকলেই দ্বিতল-ত্রিতল তুলতে শুরু করে দিয়েছেন কেন? এ পাড়ার লোকেরা কি কোনো স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছেন? হঠাৎ মনে পড়লো, হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স করপোরেশন বাড়ি তৈরির জন্য ঋণ প্রদানের শর্তগুলো অনেক সহজ করে দিয়েছেন। এবং টাকার অঙ্কটাও দিয়েছেন বাড়িয়ে। সকলেই সেই সুযোগ নিচ্ছেন। একতলায় বাস করবেন। এবং দোতলা তেতলা ভাড়া দেবেন। দশ-পনেরো বছরেই ঋণ শোধ হয়ে যাবে। তারপর পুত্র-কন্যারা এবং তাদের পুত্র-কন্যারা সুখে দিনযাপন করবে।

বছর বিশ আগেও এই অঞ্চলটা এক অনুন্নত ফাঁকা জায়গা ছিল। বড়-বড় গাছ এবং হাজার রকমের বুনো পত্রপল্লবে আবৃত এই বিশাল অঞ্চলে শিয়ালের ডাক শোনা যেতো। লোকে বলে, বাঘও নাকি আসতো। বাঘের কথাটা অতিশয়োক্তি হতেও পারে। ঘন অরণ্যেও বাঘ বিরল হয়ে গেছে, এমনকি সুন্দরবনেও নাকি সহজে চোখে পড়ে না। আসলে জায়গাটা কী পরিমাণ অনুন্নত ছিল, সেটা বোঝানোর জন্যই জনশ্রুতি এই মানচিত্রে বাঘও আমদানি করেছে। অনুন্নত অবশ্য ছিল খুবই। জায়গাটার উন্নয়নের জন্য একটা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। চেয়ারম্যান আমাকে চিনতেন। তিনি নিজেই পরামর্শ দিলেন, হাজার টাকা দিয়ে এক বিঘা জমি কিনে নিন। ঠকবেন না। আজকাল হাজার টাকা যতো সহজ শোনায়, বিশ বছর আগে তা ছিল না, হাজার টাকা পাবো কোথায়? অন্তত আমার কাছে ছিল না। তাছাড়া, জঙ্গলের মধ্যে জমি নিয়ে আমি করবোটা কী?

চেয়ারম্যান সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। জমিটা সেদিন কিনে রাখলে ঠকতাম না। হাজার টাকা দিয়ে কেনা জমি আজ পাঁচ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারতাম। কিংবা, পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনির জন্য ত্রিতল দালান তুলতাম। বিকেল চারটের

সামান্য বেশি হবে। অবিশ্বাস্যরকম খরা চলছে— এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি, যদিও জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। মাথার ওপর প্রখর রোদ, কিন্তু গলিটার দু'পাশেই উঁচু-উঁচু বাড়ি বলে, দু'পাশে ছায়া পড়েছে। এ রকমের ভয়ানক খরার সময় ছায়া দেখতে খুব ভালো লাগে; শুধু দেখলেই গা-টা জুড়িয়ে যায়। গলির ছায়ায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা কী করে না জানা থাকলে বলা কঠিন। আপিসের আরদালি হতে পারে, হতে পারে কলকারখানার সাধারণ কর্মচারী, কিংবা বাস ও ট্রাক ড্রাইভার বা অন্য কিছু। খুব কৌতূহলী হয়ে আমাদের দেখছে, দৃষ্টিতে এখনো পূর্ণ অনুমোদন নেই—এখনো আমাদের পরীক্ষা চলছে। তারা বুঝতে পেরেছে, আমরা এ পাড়ায় নতুন ভাড়াটে আসতে চলেছি; তাদের অভ্যস্ত জীবনে উপদ্রব হয়ে না আসি। আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে থাকলাম, তাদের শাণিত দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়ে পড়া ঠিক হবে না। তা হলে পেয়ে বসবে। আবার অন্যদিকেও সতর্ক হয়ে থাকলাম, আমার ভঙ্গিতে কোনো ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায়—তাহলে শুরু থেকেই একটা বিরোধের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাবে, যেটা একই পাড়ায় থাকার জন্য খুব সুখের অবস্থা নয়।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল ছয়-সাতটি তরুণ। দেখে মনে হলো, আজকালকার ছেলেরা যেমন হয় সেই রকমই। মাথায় বড় বড় চুল, পরনে জিন্স আর রঙিন শার্ট; একজনের চোখে কালো চশমা, সে সিগারেট খাচ্ছে। অন্য ছেলেরা সিগারেট খায় না বা এই মুহূর্তে খাচ্ছে না। একটা জিনিস আগেও লক্ষ্য করেছি মনে হলো। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে কি সিগারেট খাবার চল কমে গেছে? অবশ্য অফিসের পিওন, রিকশাওয়ালা—এদের মধ্যে দেখেছি সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে।

এই ছেলে কটি দেখতে ভালো, স্বাস্থ্য খুব ভালো। আরো মনে হলো, এরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। এদের চোখেও পরীক্ষকের দৃষ্টি। সকলেই একবার আমাদের ভালো করে দেখে নিলো। দৃষ্টিতে কোনো ঔদ্ধত্য নেই; কিন্তু প্রয়োজন হলে থাকবে, এটাও মনে হলো। আমরা তাদের অনুমোদন লাভ করেছি কি না ভালো বুঝলাম না। এখন সকলেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। একজনের হাতে একটা কাঁচা আম ছিল। ছুঁড়ে সামনের মাঠে ফেলে দিলো। যে সিগারেট খাচ্ছিলো, সে জুতোর তলায় সিগারেটটা পিষে ফেললো, যদিও সিগারেটটা তখনো যথেষ্ট বড় ছিল। আর একজনের হাতে বাঁশের একটা ছোট বেত ছিল। সে খুব মৃদুভাবে বেতটা দিয়ে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া ছায়াকে ঠুকতে লাগলো। সবচেয়ে বিস্ময়কর আচরণ আর একটি ছেলের। সে হঠাৎ সহাস্যে আমাদের একটা স্যালিউট দিলো। আমি মনে করেছিলাম, অন্য ছেলেরা এবার হেসে উঠবে; কিন্তু তারা কেউ হাসলো না। বরং মনে হলো ওভাবে স্যালিউট দেয়া ওরা পছন্দ করে নি।

হাসান সতর্কভাবে ছেলের পাশ কাটিয়ে বামদিকে মোড় নিলো। সাবান, তেল, ব্লেডের মনোহারী দোকান আছে। ভাললাই, ব্লেড কিনতে প্রায়ই ভুলে যাই। হঠাৎ দরকার পড়লে দূরে কোথাও যেতে হবে না। একটা পাউরুটির দোকানও দেখলাম। এটাও সুখবর। খবর অবশ্য এটা নয়—জিনিসটা যখন নিজেই আবিষ্কার করেছি। একটা মিল্ক ব্রেড আমাদের ছোট্ট সংসারে দু'দিন চলে যায়। তৃতীয় দিন অফিস যাওয়ার আগে ফাতেমা রুটি আনার কথা মনে করিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, প্রায়ই মনে থাকে না। পরদিন সকালে হাতে-বেলা রুটি খেতে হয়। তাও প্রায়ই আবার গম ভাঙানো থাকে না। ফাতেমা কোনোমতে একটা কিছু নাশতা করে দেয়। আজকাল আর আমি তা নিয়ে কোনো কথা বলি না। ফাতেমা কী জবাব দেবে জানি। বলবে, রুটিও কিনে আনবে না। হাসানকে গম ভাঙিয়ে আনার জন্য গাড়িও দেবে না। তোমার পছন্দমতো নাশতা দেবো কী করে? যাক, এখন আর সে সমস্যা থাকবে না। কাছেই পাউরুটির দোকান আছে। জেনে রাখা ভালো। এসব ছোটোখাটো জিনিস, জীবনকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করতে পারে। এই ছোট গলিতেই দু'তিনটা ডাক্তারখানা আছে। দু'জন ডাক্তার আছেন। আছেন একজন এডভোকেট। পুলিশ অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, বাংলা একাডেমির কর্মচারী, কমার্শিয়াল ফার্মের এক্সিকিউটিভ।

ছেলেটির স্যালিউটের কথা কিন্তু আমি ভুলতে পারি নি।

'পাড়াটা কেমন হবে কে জানে! দেখলে না, ছেলেটা কী রকম ফেমিলিয়ার ভঙ্গিতে স্যালিউট দিলো!'

ব্যাপারটা ফাতেমারও ভালো লাগে নি! কিন্তু বাড়িটা সে-ই বহু ঘুরে বহু চেষ্টার পর আবিষ্কার করেছে। তার ওপর সবখানেই যখন পানির সঙ্কট, তখন এ বাড়িতে পানি থাকে। সেও যদি কোনো বিরূপ মন্তব্য করে তাহলে শেষ মুহূর্তে আমি এখানে আসতে রাজি নাও হতে পারি— সে আশঙ্কা তার ছিল।

ফাতেমা বললো, দিয়েছে-দিয়েছে! নোটিশ না নিলেই হলো। আমি সে সম্পর্কে আর কিছু বললাম না; কিন্তু প্রশ্ন করলাম, বাড়িঅলার নামটা যেন কী?

ফাতেমা হেসে ফেললো।

'এতোক্ষণে তুমি বাড়িঅলার নামটাও জানো নি?'

'না! কী?'

'সোহরাব হোসেন।'

আপাতত আর কিছু জানার নেই আমার। আমি চুপ করে থাকলাম। ফাতেমাও কিছু ভাবছিল।

হঠাৎ মনে পড়লো, গাড়িটা যখন গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসছিল, নতুন বাড়ির কুকুরটা ঠিক দরজার কাছেই চুপ করে বসেছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে, হয়তো সেও নিভৃতে বসে থেকে আমাদের একবার বুঝে নিতে চায়। ঘেউ-ঘেউ

করে না। দুটি জ্ঞানী চোখ তুলে একবার দেখেছিল মাত্র। যতোক্ষণ গাড়িটা বার হয় নি, সেই একইভাবে বসেছিল। কৌতূহল হলো। আমি একবার পেছনের আর্শি দিয়ে ফিরে দেখেছিলাম। কুকুরটি উঠে দাঁড়িয়েছে। এই গাড়িটার দিকেই মুখ করে সেও কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি তখন ফিরে দেখেছিলাম ঠিকই; কিন্তু দৃশ্যটা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এখন আবার মনে পড়লো।

আমি মেনে নিতে রাজি আছি যে কুকুর প্রাণীটি খুবই উপকারী। তবু কুকুর দেখলে আমি স্বস্তিবোধ করি না। কারণটা বলছি—

খালেক ছিল আমার সহপাঠী। দু'জনেই তখন হাফ প্যান্ট আর জিপ-লাগানো গেঞ্জি পরি। জিপ-লাগানো গেঞ্জির চল সবে শুরু হয়েছে তখন। সুতরাং তাই গায়ে চড়িয়ে আমরা দুজনেই ভাবতাম, ফ্যাশনের শিখরে পৌঁছে গেছি। আমাদের অন্য সাথিরা এখনো তা পারে নি। সে আমলে বাপের টাকা থাকলেই ইচ্ছেমতো জুততা-কাপড় কেনা যেতো না। জুতোর জন্য আমাদের কোনো ভাবনা ছিল না। এক জোড়া করে জুতো নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই ছিল; কিন্তু সেটা কোথায় আছে আমরা কেউ জানতাম না। আমাদের পায়ে কখনই থাকতো না। জুতো পরাটাকে আমরা শেকল পরার মতোই অনভিপ্রেত মনে করতাম। পিচের রাস্তার স্পর্শ লাগছে পায়ের নিচে এ-রকম না হলে বেঁচে থাকাতেই কোনো আনন্দ নেই। স্কুলে কিংবা বিয়ে শাদীতেও আমরা কখনো জুতো পরে যেতাম না। কিন্তু জামা-কাপড়ের বেলায় আমাদের মনোভাব অন্যরকম ছিল। ফিল্মে তখন প্রমথেশ বড়ুয়ার রাজত্ব। উঁচু কলারের পাঞ্জাবি পরার খুব শখ আমাদের; কিন্তু সেটি হওয়ার জো নেই। তবে হ্যাঁ, একেবারে নতুন আমদানি জিপ লাগানো গেঞ্জি পরা যেতে পারে।

কিন্তু হলে হবে কী। বছরে একবারই আমাদের জন্য জামাকাপড় কেনা হতো। সব বাড়িতেই সেই একই নিয়ম ছিল। এ বছরের কাপড় কেনা হয়ে গেছে। তারপরই এলো সেই মন-ভোলানো জিপ-লাগানো গেঞ্জি। সামনের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। ছিঁড়ে গেলে, কিংবা ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেললে যে সেটার বদলে নতুন একটা গেঞ্জি কিনতে পারবো, আমাদের ছেলেবেলার অবস্থাটা অতো সুখের ছিল না। সেই জামাটাই সেলাই করে দেয়া হতো। আগামী বছর পর্যন্ত তাই পরে থাকো।

কিন্তু আমার ভাগ্যে একটা জুটে গিয়েছিল—ঐ রকম জিপ-লাগানো গেঞ্জি বা টি-শার্টও বলা যেতে পারে। জিনিসটা লাভ করে আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল আজ কেউ তা বুঝবেন না। আমার ভাগ্যটা সাধারণত অমন সুপ্রসন্ন ছিল না। অন্য ছেলেমেয়েদের জন্য তো তাও বছরে একবার কাপড় কেনা হতো। সাধারণত এ্যানুয়াল পরীক্ষার ফল বেরোবার পর। রেজাল্ট ভালো হলে, মোটের ওপর ভালো

জামা-কাপড়; আর না হলে, মোটা কাপড়। বেশির ভাগ বাড়িতেই এই নিয়ম ছিল।

আমার কপালে নতুন মোটা কাপড়ও জুটতো না। জুটতো মিহি দামি কাপড়; কিন্তু ব্যবহৃত। কোনো-না-কোনো চাচাতো বা ফুপাত বা মামাত ভাইয়ের ছোট হয়ে যাওয়া কাপড়ই ছিল সাধারণত আমার জন্য বরাদ্দ। বেশির ভাগ কাপড় আসতো আমার এক মামাত ভাইয়ের কাছ থেকে। সেই বয়সে ছেলেরা লম্বা হতে থাকে, আর প্রতি বছর কাপড় ছোট হয়ে যায়। ছেলেবেলায় সেই মামাত ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মামা থাকেন কোমেদানবাগান লেনে।

তিনি সরকারের পদস্থ কর্মচারী। বাড়িটা ছিল জমি থেকে অনেক উঁচুতে। কিন্তু বাড়িটার ভিত একটু অদ্ভুত রকমের। বাড়ির তলাটা ফাঁকা। সিমেন্ট-সুরকি-ইট দিয়ে ঠাসা নয়। স্থাপত্যের দিক দিয়ে কী করে সম্ভব হয়েছিল জানি না। বাড়িটা যেমন পুরনো তেমনি বিশাল। তলাটা ফাঁকা, জায়গায়-জায়গায় থামের মতো আছে। তলাটাকে অনেকগুলো গুহা মনে হয়। বাড়ির চারদিকে সেই তলায় যাওয়ার জন্য গোলাকার পথ আছে—দু'ফুটের বেশি উঁচু হবে না। আমরা মাথা নিচু করে সেই পাতালপুরীতে প্রবেশ করতাম। ঢুকবার পথটাই শুধু দু'ফুট হবে; কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে আরামে বসা যায়, মাথায় কিছু ঠেকে না। এই জায়গাটিকে আমাদের সকলের কাছেই খুব রহস্যময় আর সে কারণেই খুব আকর্ষণীয় মনে হতো। আমরা দল বেঁধে এইখানে রবিন হুড আর রঘু-ডাকাত খেলতাম। সামার ভেকেশনের সময় যারা নাইন-টেনে পড়তেন, তারা এখানেই চুপ করে বসে তাস খেলতেন আর সিগারেট খেতেন। অবশ্য, যে-কোনো একজনকে পাহারায় থাকতে হতো। মামা জানেন, এইখানে আমাদের আড্ডা বসে। এবং আমাদের মধ্যে যারা বড় তারা নিজেরা তাস তো খেলেই, ছোটদেরকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই ঐ সুড়ঙ্গে যাওয়া ছিল কঠোরভাবে মানা। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, যে জিনিসটা আকর্ষণ করে বেশি, সেটাই মানা। আর একটি কারণ ছিল। এখানে সাপও আছে।

মামার পদধ্বনি শোনা গেলেই, উল্টো কোনোদিকের পথ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে, তিনি ঘরে ঢুকবার আগেই, বিরাট হলের মার্বেলের মেঝেতে আমরা এসে শুয়ে পড়তাম। মামার ভেতরে আসতে একটু দেরি হতো। বাইরের আউট-হাউসগুলোর কে-কী করছে সেটা একবার তদারক করে তিনি ভেতরে আসতেন।

দুটি দৃশ্য ছিল মামার খুব প্রিয়। আমরা গোল হয়ে বসে পড়াশোনা করছি এই দৃশ্যটি ছিল সবচাইতে প্রিয়। তারপরই হলো, সামার ভেকেশনের সময় সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে ভাতটাত খেয়ে আমরা মেঝেতে দল বেঁধে শুয়ে আছি, প্রথমটার পর এইটাই ছিল তাঁর সবচাইতে প্রিয় দৃশ্য।

আমার জীবনের প্রথম চুম্বনের স্মৃতিও এই পাতালপুরীর সঙ্গে জড়িত। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি কী—সে বয়সেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, দেখি যে, গোসলখানার মধ্যে—তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, বড়রা সবাই নামাজ পড়ছেন দেখি যে বাবর ভাই, হাসিনার মার মেয়ে হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন। হাসিনার মা এই বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিলো, দেখি, তারপর কী হয়। তারপরও কিছু কিছু হয় আমি আগে দেখে ফেলেছি, তাই জানি। আমরা সেবার মেদিনীপুর গিয়েছিলাম। বাড়িটা ছোট। কে কোথায় শোবে, তাই নিয়ে একটা সমস্যা হলো। আমাকে শুতে দেয়া হলো আমার দূর সম্পর্কের বোন শাহজাদী আপার ঘরে। শাহজাদী আপার নতুন বিয়ে হয়েছে। দুলাভাই মানতেই হবে—রাজপুত্রের মতো সুন্দর দেখতে। রাতে আমরা শুয়ে আছি। সে সময় খুব বেশি জায়গায় ইলেকট্রিসিটি ছিল না—এখানেও নেই। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ঘরটির একপাশে লণ্ঠন জ্বলছে; কিন্তু সলতেটা নিচু করে দেয়া হয়েছে।

মেদিনীপুর যতোবারই এসেছি, এক অসহ্য গ্রীষ্মকাতরতায় ভুগেছি। মেদিনীপুর সম্পর্কে আর একটি শৈশব স্মৃতি; কাঁচা আম দিয়ে ডাল রান্না আর মাটির বাসনে ভাত খাওয়া। এখানে আমাদের অনেক পূর্বপুরুষের মাজার আছে। মাঝে-মাঝে দল বেঁধে জিয়ারত করতে আসতাম। আরও একটা-দুটো শৈশব স্মৃতি আছে। পূর্ব-পুরুষদের মাজার জিয়ারত করাটা একটা পুণ্যকর্ম এবং পুণ্যকর্ম করবার সময় শরীরকে খুব কষ্ট দেয়া উচিত। আমাদের এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছিল এবং যারা শিক্ষাটা দিতেন তাঁরাও এই নীতিটা মেনে চলতেন। জিয়ারতে আমরা আসি ছুটি-ছাঁটার মধ্যে। এবং যেহেতু সামার ভেকেশনটাই সবচাইতে বড় ছুটি, তাই সেইটাই ছিল আসবার সময়। আমি এখন যে সময়ের কথা বলছি, তখনও আমি স্কুলে ভর্তি হই নি।

যাই হোক, প্রচণ্ড রোদকে মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে আমাদের আসতে হতো কবরস্থানে। ছোট ছোট পাথর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল কবরস্থানে যাওয়ার পথে। এবং বলাই বাহুল্য, জুতো পরা একেবারে মানা। পাথরগুলো রোদে তেতে আছে, আর তারই স্পর্শ লাগতো আমার চার পাঁচ বছরের পায়ে। গরম থেকে পা-কে বাঁচানোর জন্য লাফ দিয়ে সামনে যেতাম। আবার পা পড়তো সেই গরম পাথরে। আবার লাফ, আবার সেই পাথর। আমার কষ্ট দেখে আম্মার কষ্ট হতো; কিন্তু তিনি কিছু বলতেন না। তিনি বাড়িতে ফিরে বলতেন, দোজখে মানুষকে আল্লাহতালা কী শাস্তি দেবেন, এখন থেকেই একটু বুঝে রাখো। গোনাহর পথ থেকে দূরে রাখাই ছিল আমাদের এইসব ছোটোখাটো কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য। গেলাসে করে নানা রঙের সিরাপ মাখানো বরফের কুঁচি বিক্রি হচ্ছে। রীতিমতো বিলিতি সিরাপ। আজকালকার মতো নয়। কিন্তু কারবালার দুঃখ বোঝানোর জন্য

আমাদের তা খেতে দেয়া হতো না। দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই, সুরুচি রক্ষা করে কী করে সেকথা বলবো, সেটাই একটা সমস্যা। তবুও কথাটি আমাকে বলতে হবে। এখনো সে কথাটি যে আমার মনে পড়ে নিশ্চয় তার কোনো গূঢ় কারণ আছে।

যে বাড়িতে আমরা এসে উঠেছিলাম, সেখানে পায়খানা করবার যে ব্যবস্থা ছিল সেরকম আর কোথাও দেখি নি। পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেড়তলা উঁচু একটি মঞ্চের মতো জায়গায় যেতে হতো। সে জায়গাটিও পাকা। অনেক নিচে মলের গামলা ছিল। স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাটা ভেতরে। পুরুষদের জন্য একই ব্যবস্থা বাইরে—বাঁশঝাড়ের মধ্যে। সাত আটদিন ছিলাম এই বাড়িতে। আমি বাইরেরটাই ব্যবহার করতাম। আমার সঙ্গে একজন লোক যেতো। দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো সে। একজন লোক থাকতো এই জন্য যে, বাঁশঝাড়ঘেরা ঐ জায়গাটিতে ছিল ভূতের উপদ্রব। একা সেখানে যাবো, সে সাহস তো আমার ছিলই না—বাড়ির লোকজনেরও ছিল না।

আমার মনে পড়ে, সেইখানে বসে আমি প্রাণপণে আওড়াতাম, 'ভূত না পুত। পেত্নী আমার ঝি। রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে, করবি আমার কী?" আওড়াতাম আর যতো শিগগির সম্ভব, কাজটা সেরে চলে আসতাম। ছড়াটা কোথায় কে শিখেছিল কেউ জানে না। কিন্তু রাত্রিবেলা অনেকের মুখেই শোনা যেতো। 'রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে', এই কথাগুলো নিয়ে আপত্তি উঠতো মাঝে-মাঝে। মুসলমানের সহায় কোনো মুসলমান মহাপুরুষেরই হওয়া উচিত। সেইভাবে ছড়াটাকে বদলে নেয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু অমন একটি জায়গার সঙ্গে পবিত্র কোনো কিছুর নাম জড়িত করা সম্পর্কেও ঘোরতর আপত্তি ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণই টিকে থাকলেন। কোনো কোনোদিন সঙ্গে দেয়ার জন্য লোক পাওয়া যেতো না। আমার বয়স মাত্র চার। তাই সেই সময় আমাকে ভেতরের জায়গাটা ব্যবহার করার অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। পাশাপাশি তিনটা বসার জায়গা। দরকার হলে তিনজন ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু একটির পর আর একটির মাঝখানে কোনো আড়াল নেই।

একদিন শাহজাদী আপা এসে বসেছে। আমিও উঠে এসে পাশের আসনটায় বসে পড়লাম। শাহজাদী আপা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বরং বসে-বসে আমার সঙ্গে বেশ গল্প করতে লাগলেন। এই দৃশ্যটার কথাই বলছিলাম। শাহজাদী আপার বিয়ে হয়ে গেছে সম্প্রতি খুব ধুমধামের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। আর আমার চার। তার মানে এগারো বছরের ব্যবধান। আমার যখন উনিশ, তাঁর তিরিশ। তখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বহুবার। কিন্তু পনেরো বছর আগেকার ঘটনা কি তার মনে আছে? দুএকবার মাথায় দুষ্টু চিন্তা এসেছে। ভেবেছি, তাঁকে একবার জিগ্যেস করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি। কিন্তু

বলছিলাম, এক ঘরে শোয়ার কথা। আমার বয়স চার। বাড়িতে জায়গা কম। তাই শাহজাদী আপাদের সঙ্গেই আমাকে শুতে দেয়া হলো। রাত খুব বেশি হয় নি। কোণে লণ্ঠনটা টিমটিম করছে। ঘরের ভেতর আবছা আলো আর আবছা অন্ধকার। দারুণ গরম। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

দৃশ্যটা চোখে পড়লো তখনি।

এরই কিছুদিন পরই সেই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা—বাবর ভাইয়ের আলিঙ্গনে হাসিনার মার মেয়ে হাসিনা।

হাসিনার মার যেমন একটি ষোড়শী কন্যা ছিল, তেমনি ছিল ছয়-সাত বছরের আর এক মেয়ে, নাম তহমিনা। আমার চাইতে দু'তিন বছরের বড়। আমরা গোল্লাছুট খেলতাম। তহমিনা এসে লুকোতো সেই পাতালপুরীতে। সেখানে এসে আমি তাকে ধরে ফেললাম।

দু'জনেই ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন চুপ করে বসে দম নিচ্ছি। এক সময় আমার মাথায় সেই বুদ্ধিটা এলো। তহমিনার গলা জড়িয়ে তাকে একটা চুমু খেলাম। বললাম, তহমিনা, এটাকে বলে চুমু।

তহমিনা বললো, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি জানি।

তহমিনা বললো, তুমি আমাকে কী দেবে?

দেবো আবার কী?

দিতে হয়। হাসিনা বুবুকে বাবর ভাই দেয়।

তুমি কী করে জানলে?

জানি। কথাটা বলেই তহমিনা এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন ওসব জানার চাইতে সহজ আর কিছুই নাই।

আমার পকেটে লজেন্স ছিল। তহমিনাকে একটা দিলাম।

সেই যে হলঘরটি যেখানে মামাকে দেখতে পেলেই আমরা ছুটে পালিয়ে আসতাম আর দিবানিদ্রার ভান করতাম, তার মেঝেটা ছিল শ্বেতপাথরে তৈরি এবং খুব ঠাণ্ডা। ভান করতে করতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়তাম। রাতে কিন্তু মেঝেতে আমাদের শুতে দেয়া হতো না। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-জ্বর হবে বলে। বিরাট হল; প্রয়োজন হলে সেখানে জনসভা করাও সম্ভব ছিল। ছাদ খুব উঁচু; আজকালকার দোতলার সমান উঁচু। বাড়িটি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের; অনেকে বলে ওয়ারেন হেস্টিংস কিছুদিন এই বাড়িতে বাস করেছেন। কী কারণে জানি না, যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় এ-বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। রাত্রিবেলা লণ্ঠন জ্বলতো। ন'টার মধ্যে সকলেই ঘুম। রাত জাগাটাকে ভালো চোখে দেখা হতো না—সেটা ছিল বখাটেপনার পরিচয়। এমনকি, স্কুল-কলেজের পাঠ তৈরি করবার জন্যও বেশি রাত করাটা মানা ছিল। একটা ধারণা চালু হয়ে গিয়েছিল যে, রাত